ষষ্ঠ শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতায়
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price
১৭৫/-
(একশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

অ-আ, ক-খ, ইংরেজি বর্ণমালা কিংবা গণিতের নামতা গোনা যাঁর হাত ধরে প্রথম শেখা। যাঁর চোখে চোখ রেখে আমরা দেখেছি নিজকে জয়ের প্রথম স্বপ্ন। যাঁর নিরলস চেষ্টায় আমরা বুঝতে শুরু করেছি পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থেকে বিশ্বকে।

হ্যাঁ, বলছি জীবনের প্রথম শিক্ষকের কথা যাঁর ব্যয়িত শ্রম এবং ত্যাগের কারণেই আজকের আমরা...

সূচিপত্র

ষষ্ঠ শ্রেণি

বাংলা ২য় পত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব্যাকরণ অংশ	
০১	ভাষা ও বাংলা ভাষা	০১-০৮
০২	ধ্বনিতত্ত্ব	০৯-২৪
০৩	রূপতত্ত্ব	২৫-৩৩
০৪	বাক্যতত্ত্ব	৩৪-৩৬
০৫	বাগর্থ	৩৭-৪২
০৬	বানান	৪৩-৪৪
০৭	বিরামচিহ্ন	৪৫-৪৭
০৮	অভিধান	৪৮-৫০
	নির্মিতি অংশ	
০৯	অনুধাবন	৫১-৫২
১০	সারাংশ ও সারমর্ম রচনা	৫৩-৫৬
১১	ভাব-সম্প্রসারণ	৫৭-৬১
১২	পত্র রচনা	৬১-৬৫
১৩	অনুচ্ছেদ রচনা	৬৬-৬৮
১৪	প্রবন্ধ রচনা	৬৯-৯২

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, ষষ্ঠ শ্রেণির 'Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) ষষ্ঠ শ্রেণির 'Parallel Text' এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: ষষ্ঠ শ্রেণির 'Parallel Text' বাংলা ২য় পত্র, পৃষ্ঠা-২০, প্রশ্ন-১২, দেওয়া আছে, '৩' কিন্তু হবে '৫'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অধ্যায় ০১
ভাষা ও বাংলা ভাষা

১.১ ভাষা

তোমরা জানো, প্রাণিজগতে কেবল মানুষেরই ভাষা আছে। ভাষার সাহায্যে আমরা কথা বলি ও মনের ভাব প্রকাশ করি। ভাষার মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি আমাদের অভিজ্ঞতা, নানা ধরনের আবেগ, বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি, যেমন- হিংসা, বিদ্বেষ, ভালোলাগা ও ভালোবাসা, ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদি। ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম। ভাষাকে দেশগঠনের হাতিয়ার হিসেবেও গ্রহণ করা হয়। দেশের অগ্রগতি বা কল্যাণসাধন কীভাবে করা যাবে, কীভাবে দেশের মানুষের মঙ্গল করা সম্ভব – সেসব কথা ভাষার মাধ্যমেই মানুষের কাছে তুলে ধরতে হয়।

সংজ্ঞা: 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবহিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।' (ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

মূলত মানুষের মনোভাব-প্রকাশক কণ্ঠনিঃসৃত অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

ভাষা দুই প্রকার- (ক) মৌখিক ভাষা (Oral Language) ও (খ) লিখিত ভাষা (Written Language)।

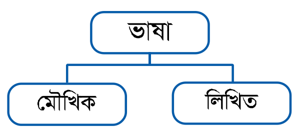

(ক) মৌখিক ভাষা:

সংজ্ঞা: মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ভাষাই হলো মৌখিক ভাষা।

প্রাচীনকালে লেখার ব্যবস্থা বা লিখিত ভাষার প্রচলন ছিল না। মুখের ভাষাই তখন মানুষের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম ছিল। এখনো বিশ্বের বহু ভাষা মৌখিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রত্যেকেরই ভাষা আছে। কিন্তু তাদের সব ভাষা লিখে রাখার ব্যবস্থা নেই; মুখে-মুখে সেগুলো প্রচলিত আছে। যেসব ভাষা লেখার কোনো ব্যবস্থা নেই সেগুলোই হলো মৌখিক ভাষা।

(খ) লিখিত ভাষা:

সংজ্ঞা: মুখের ভাষাকে বিভিন্ন সংকেত, চিহ্ন, প্রতীক ইত্যাদির মাধ্যমে যখন প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় লিখিত ভাষা।

মুখের ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে। পৃথিবীতে বহু ভাষার জন্ম হয়েছে; কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনেক ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে। কোনকিছুর কাছে হার স্বীকার করা মানুষের ধর্ম নয়। তাই মানুষ চেষ্টা করেছে তার ভাষাকে ধরে রাখতে, যাতে ব্যক্তির মৃত্যুর পরও ভাষা বেঁচে থাকে। এভাবেই একদিন আবিষ্কৃত হয়েছে লিখন-ব্যবস্থা (Writing-System)। বিশ্বের ভাষাগুলো লেখার নানা ব্যবস্থা রয়েছে।

➢ **ভাষার লিখন-ব্যবস্থা প্রধানত তিন প্রকার:**

০১। **বর্ণভিত্তিক (Alphabetic):** বিশ্বের অনেক ভাষারই বর্ণ আছে; যেমন- বাংলা, ইংরেজি, রুশ, হিন্দি, তামিল প্রভৃতি। এসব ভাষার লিখনব্যবস্থা হলো বর্ণভিত্তিক।

০২। **অক্ষরভিত্তিক (Syllabic):** অক্ষর (Syllable) বলতে বোঝায় কথার টুকরো অংশ। কথা বলার সময় আমরা এ- অংশই উচ্চারণ করি। একে উচ্চারণের একক (unit) ধরা হয়। একে দল-ও বলে। অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে বলে অক্ষরভিত্তিক লিখনরীতি। যেমন- জাপানি ভাষা।

০৩। **ভাবাত্মক (Idiographic):** বিশ্বে এমন কিছু ভাষা আছে যেগুলো লেখার জন্য বর্ণ কিংবা অক্ষর- কোনোটিই ব্যবহার করা হয় না। অনেকটা ছবি এঁকে এসব ভাষা লেখা হয়। এই লিখন-ব্যবস্থাই হলো ভাবাত্মক। চীনা ও কোরীয় ভাষা এ-পদ্ধতিতে লেখা হয়।

১.২ ভাষার উপাদান

❖ ভাষার প্রধান উপাদান চারটি- (ক) ধ্বনি, (খ) শব্দ, (গ) বাক্য ও (ঘ) বাগর্থ।

ভাষার উপাদান
- ধ্বনি
- শব্দ
- বাক্য
- বাগর্থ

(ক) ধ্বনি (Sound):

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য আওয়াজকে আমরা সেই ভাষার ধ্বনি বলতে পারি।

ধ্বনি হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান। বাতাসে আঘাতের ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সব ধ্বনিই ভাষার ধ্বনি নয়। ভাষায় তাকেই ধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যা বাগ্‌যন্ত্র (Speech Organs)-এর সাহায্যে তৈরি হয়। বাগ্‌যন্ত্রের ক্ষমতা অসীম। এর সাহায্যে আমরা পশু-পাখির ডাক থেকে নানারকম ডাক ডাকতে বা অনুকরণ করতে পারি। কিন্তু এসব ভাষার ধ্বনি নয়। ভাষার ধ্বনি শুধু বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত হলে চলবে না, তাকে অবশ্যই অর্থপূর্ণ হতে হবে। পশু-পাখির ডাক কিংবা এজাতীয় কোনো ডাককে আমরা বলি আওয়াজ (noise)। ভাষার একটি ধ্বনির জায়গায় আর-একটি ধ্বনি বদলে দিলে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেমন- 'কাল'। এখানে 'ক্' ধ্বনিটি বদলিয়ে 'খ্' বললেই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দ তৈরি হয়। যেমন- খাল, গাল, তাল, ঢাল, শাল ইত্যাদি। এভাবে আমরা খ্ গ্ ত্ ঢ্ শ্ ধ্বনি পাই। সব মানুষই তাদের নিজেদের ভাষায় প্রচলিত ধ্বনি চেনে ও তার অর্থ বোঝে।

(খ) শব্দ (Word):

এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন- মানুষ। এখানে পাঁচটি ধ্বনি আছে: ম্+আ+ন্+উ+শ্(ষ)।

লক্ষ করো, এ-উদাহরণে শেষ ধ্বনিটি বোঝাতে তালব্য-শ লিখে প্রথম বন্ধনীতে মূর্ধন্য-ষ লেখা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, মূর্ধন্য-ষ ধ্বনি নয়, বর্ণ।

এক বা একাধিক ধ্বনি মিলে যখন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তখন আমরা সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলতে পারি।

(গ) বাক্য (Sentence):

বাক্য বলতে কথা বা বাচন (Speech)- কে বোঝায়। ভাষার উপাদান হিসেবে ধরলে বাক্যের স্থান তৃতীয়। ধ্বনি দিয়ে যা শুরু হয়েছিল শব্দে এসে তা আরও অর্থবহ হয়। বাক্যে এসে পরিপূর্ণ না হলেও এটি অনেকটাই পূর্ণতা পায়। প্রতিটি বাক্যই কেউ উৎপাদন করে আর কেউ শোনে। বাক্যের সঙ্গে তাই দুজনের সম্পর্ক রয়েছে- বক্তা (Speaker) ও শ্রোতা (Hearer)। এই দুই পক্ষের মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকলে চলে না। বক্তা যা বলে তাতে শ্রোতার সব কৌতূহল মিটতে হয়।

চিত্র : ১.১ : বক্তা ও শ্রোতা

এজন্য বলা হয়: যা উক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ এবং যাতে শ্রোতা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় তা-ই হলো বাক্য।

অনেকগুলো শব্দ বা পদ পাশাপাশি সুবিন্যস্তভাবে বসে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করলে সেটিই বাক্য।

যেমন- আমরা বাংলাদেশে বাস করি। সততা একটি মহৎ গুণ।

(ঘ) বাগর্থ (Semantics):

অভিধানে শব্দের অর্থ থাকে। কিন্তু সেই শব্দ যখন বিশেষ পরিবেশে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ বদলে যায়। একই কথা বাক্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা শব্দের সাহায্যে যে-বাক্য তৈরি করি, তার অর্থ বাক্যে গিয়ে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- 'পোড়া' একটি শব্দ। এর অর্থ 'দগ্ধ হওয়া' (আগুনে তার খড়ের ঘর পুড়ে গেছে)। শব্দটি দিয়ে যখন বাক্য তৈরি করে বলা হয় 'আমার মন পুড়ছে'- তখন এ-'পোড়া' অর্থ দগ্ধ হওয়া নয় বরং কাউকে মনে পড়া। ভাষার শব্দ ও বাক্যের এসব অর্থের আলোচনাই হলো বাগর্থ।

বাক্যে প্রয়োগ বিবেচনায় কোনো শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রকাশকেই বাগর্থ বলা হয়।

➢ ভাষার উপাদানের উদাহরণসহ বৈশিষ্ট্য–

ভাষার উপাদান	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ধ্বনি	নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য আওয়াজ।	অ, ক্, গ্, ঢ্
শব্দ	সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টি।	মানুষ, কলম, গাছ, হাত
বাক্য	মনের ভাব প্রকাশক সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি।	আমরা বাংলাদেশে বাস করি। সদা সত্য কথা বলবে।
বাগর্থ	বাক্যে প্রয়োগ বিবেচনায় কোনো শব্দের বিভিন্ন অর্থ।	পোড়া-দগ্ধ হওয়া; মনে পড়া

১.৩ প্রকাশমাধ্যম ও ভাষা

ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়। এজন্য আরও কিছু মাধ্যম রয়েছে। ভাষা আবিষ্কারের পূর্বে নানারকম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, কখনো আবার ছবি এঁকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছে। এজন্য নানা ধরনের চিহ্ন এবং সংকেতও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা মুখ বা চেহারার নানা ভঙ্গি করে হাসি, কান্না, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি বোঝাতে পারি। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না বোঝাতে পারি। এজাতীয় ভাষাকে বলে অঙ্গভঙ্গির ভাষা (Gesture Language)। রাস্তায় দেখা যায়, ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারায় গাড়ি থামায়, আবার চলার নির্দেশ দেয়। রাস্তার দু'পাশে অনেক নির্দেশ থাকে- কোন দিকে গাড়ি চলবে, কোন দিকে গাড়ি চলবে না, রাস্তা সোজা না বাঁকা, পথচারী কীভাবে রাস্তা পার হবে ইত্যাদি। যারা কথা বলতে ও শুনতে পায় না তাদের আমরা বলি মূক ও বধির। তাদের ব্যবহারের জন্য এক ধরনের ভাষা আছে। হাতের আঙুল ব্যবহার করে, কখনো আঙুল মুখে ছুঁয়ে, কখনো আবার হাত মাথায় উঠিয়ে, কখনো বুকে হাত দিয়ে তারা তাদের ভাব প্রকাশ করে। ভাষার মধ্যে এই যোগাযোগও পড়ে। একে বলে সংকেত ভাষা (Sign Language)। এটি ইশারা ভাষা হিসেবেও পরিচিত।

এসো আমরা প্রচলিত কিছু সাংকেতিক চিহ্ন দেখি-

	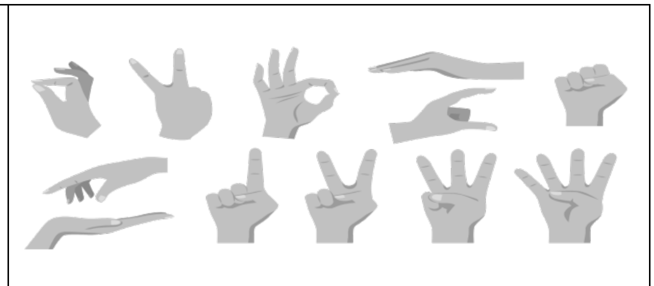
চিত্র: সাংকেতিক চিহ্ন	চিত্র: ইশারা ভাষা

১.৪ মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা

মাতৃভাষা অর্থ মায়ের ভাষা। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা মায়ের কাছ থেকে যে-ভাষা শিখি তা-ই হলো আমাদের মাতৃভাষা (Mother Language)। শিশু সব সময়ই যে মায়ের কাছ থেকে ভাষা শেখে তা নয়। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। মায়ের মতো যে শিশুকে প্রতিপালন করে কিংবা জন্মের পর থেকে যার সেবায় ও যত্নে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার ভাষাই শিশু প্রথম শেখে। শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত শেখে। বাঙালি মায়ের সন্তান জন্মের পর থেকে স্প্যানিশ বা জার্মানভাষী মায়ের পরিচর্যায় বড়ো হলে তার প্রথম বা মাতৃভাষা কখনো বাংলা হবে না, হবে স্প্যানিশ বা জার্মান।

সংজ্ঞা: শিশু প্রথম যে ভাষা শেখে তা-ই তার প্রথম ভাষা (First Language) বা মাতৃভাষা।

সাধারণত দেখা যায় যে, বাঙালি মায়ের শিশুর মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজ মায়ের শিশুর ইংরেজি, আরবি মায়ের শিশুর আরবি, জাপানি মায়ের শিশুর জাপানি।

১.৫ ভাষার রূপ বৈচিত্র্য

ভাষার কোনো অখণ্ড বা একক রূপ নেই। একই ভাষা নানা রূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি তারা সকলে বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সকলের বাংলা আবার এক নয়। ভৌগোলিক ব্যবধান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমাজগঠন, ধর্ম, পেশা ইত্যাদি কারণে এক এলাকার ভাষা থেকে অন্য এলাকার ভাষায় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

আমাদের প্রতিটি জেলার ভাষাই বৈচিত্র্যপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেক জেলার নিজস্ব উপভাষা রয়েছে। উপভাষায় কথা বলা মোটেও দোষের নয়। উপভাষা হলো মায়ের মতো। মাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, নিজ-নিজ উপভাষাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। কিন্তু সকলের বোঝার জন্য তো একটি আদর্শ রূপ থাকা চাই। ভাষার সেই আদর্শরূপকেই আমরা বলি প্রমিত ভাষা।

(ক) উপভাষা (Dialect)

ভাষিক সম্প্রদায়: একই ভাষা যারা ব্যবহার করে তাদেরকে বলে একই ভাষাভাষী বা ভাষিক সম্প্রদায় (Language Community)।

আঞ্চলিক বা উপভাষা: ভৌগোলিক ব্যবধান বা অঞ্চল ভেদে ভাষার যে-বৈচিত্র্য তা-ই হলো উপভাষা। এ-ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা-ও বলা হয়।

নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার পরিচয় দেওয়া হলো।

উপভাষিক এলাকা	উপভাষার নমুনা	উপভাষিক এলাকা	উপভাষার নমুনা
খুলনা-যশোর	অ্যাকজন মান্‌শির দুটো ছাওয়াল ছিল্।	ময়মনসিংহ	অ্যাকজনের দুই পুৎ আছিল্।
বগুড়া	অ্যাকজনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল্।	সিলেট	অ্যাক মানুশর দুই পোয়া আছিল্।
রংপুর	অ্যাকজন ম্যানশের দুইক্না ব্যাটা আছিলো।	চট্টগ্রাম	এগুয়া মানশের দুয়া পোয়া আছিল্।
ঢাকা	অ্যাকজন মানশের দুইডা পোলা আছিলো।	নোয়াখালী	অ্যাকজনের দুই হুত আছিল্।

(খ) প্রমিত ভাষা (Standard Language)

সংজ্ঞা: একই ভাষার উপভাষাগুলো অনেক সময় বোধগম্য হয় না। এজন্য একটি উপভাষাকে আদর্শ ধরে সবার বোধগম্য ভাষা হিসেবে তৈরি ভাষারূপই হলো প্রমিত ভাষা।

এ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদিত হয়। দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক (electronic) মাধ্যমে এ-ভাষারূপ ব্যবহার করা হয়।

❖ উপভাষা ও প্রমিত ভাষার পার্থক্য:

প্রমিত ভাষা	উপভাষা
১। প্রমিত ভাষার লিখিত ব্যাকরণ থাকে	১। উপভাষার লিখিত ব্যাকরণ থাকে না।
২। প্রমিত ভাষা চর্চা করে শিখতে হয়।	২। উপভাষা শিশুকাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে অর্জন করতে হয়।
৩। প্রমিত ভাষা শেখার বিষয়।	৩। উপভাষা অর্জনের বিষয়।

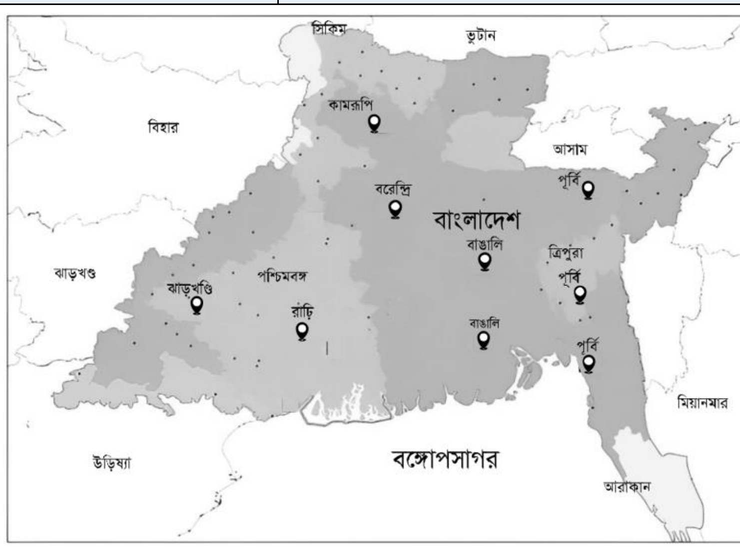

চিত্র: বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

❖ **কথ্যভাষা (Spoken Language)**

শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন, কিংবা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা বক্তব্য উপস্থাপন করি তখন ভাষা ব্যবহারে সচেতনতা দেখা যায়। অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে বন্ধু কিংবা সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ-ভাষারূপ ব্যবহার করা হয়।
বিশেষ পরিবেশ ও প্রয়োজনের বাইরে যখন ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে কথ্যভাষা বলে।

❖ **ব্যক্তিভাষা (Idiolect)**

একই ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করলেও সবার ভাষা একরকম হয় না। ব্যক্তির এই নিজস্ব পরিচয় যে ভাষারূপের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তা-ই হলো ব্যক্তিভাষা। ধ্বনির উচ্চারণ, শব্দ-নির্বাচন ও তা ব্যবহার এবং বাক্যগঠনের স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে ব্যক্তিভাষা তৈরি হয়। মৌখিক ও লিখিত উভয় ভাষারূপের ব্যক্তিভাষা হয়। মহৎ সাহিত্যিকরা প্রত্যেকে নিজস্ব ভাষারূপ সৃষ্টি করেন। রচনা পড়লেই আমরা বুঝি কোনটি কার রচিত। যেমন- রবীন্দ্রনাথের রচনা, নজরুলের রচনা।

❖ **সামাজিক ভাষা (Sociolect)**

সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণির ভাষাকে বলে সামাজিক ভাষা। সকল মানুষ একইরকম আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নয়। সামাজিক পরিচয়ই ভাষাকে নির্ধারণ করে দেয়। এ ভাষা দুরকমের:

➢ **উচ্চশ্রেণির ভাষা (High-Class Variety):** এ-ভাষা সমাজের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা যারা লাভ করেছে তারা ব্যবহার করে। একে আমরা অভিজাতদের ভাষাও বলি।

➢ **নিম্নশ্রেণির ভাষা (Low-Class Variety):** সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যারা কম লাভ করেছে, শিক্ষা- দীক্ষার সুযোগ যারা তেমন পায়নি, যারা নিরক্ষর, আর্থিক দিক থেকে তেমন সচ্ছল নয়- তাদের ভাষাকে এ-পরিচয়ে উল্লেখ করা হয়।

❖ **পেশাগত ভাষা (Professional Language)**

সমাজের কোনো বিশেষ পেশার মানুষের ভাষাবৈচিত্র্যই হলো পেশাগত ভাষা। যেমন- চিকিৎসকদের ভাষা; আইনজীবীদের ভাষা; ইত্যাদি।

❖ **দ্বিতীয় ভাষা (Second Language)**

মাতৃভাষা ছাড়া যেকোনো ভাষাকেই দ্বিতীয় ভাষা বলে। একে বিদেশি ভাষা (Foreign Language)-ও বলা হয়। আমাদের দেশে দ্বিতীয় ভাষা হলো মূলত ইংরেজি। ধর্মীয় কারণে আমরা অনেকে আরবি, সংস্কৃত, পালি ভাষা শিখি। এগুলোও দ্বিতীয় ভাষা।

❖ **সাধু ও চলিত ভাষা**

মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষারূপ লিখিত ভাষায় গ্রহণ করা হয় না। মুখের ভাষা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হলেও লিখিত ভাষা সে-তুলনায় কিছুটা কৃত্রিম। বাংলা লিখিত ভাষা যখন উদ্ভাবিত হয় তখন উদ্ভাবকরা সেভাবে বাংলা গদ্যের ভাষাকে তৈরি করেছিলেন। এ-ভাষাই সাধুভাষা বা সাধুরীতি হিসেবে পরিচিত।

জেনে রাখো

সাধুভাষার সৃষ্টিতে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা বাংলা ভাষী হলেও সাধারণ মানুষের ভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ফলে সেই ভাষার আদলে তাঁরা ভাষার এই রীতি তৈরি করেন। সব পণ্ডিতই যে এ-আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁদের সে-প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে গ্রহণ করা হয়নি। সাধুভাষার পরিচয় গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, এ-ভাষায় বেশি পরিমাণে সংস্কৃত শব্দই শুধু নেই, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় গৃহীত হয়েছে। প্রথম দিকের সাধুভাষা ছিল আড়ষ্ট। এ-ভাষা প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে অনেক দিন লেগেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম এ কাজ করেন। এজন্য তাঁকে বাংলা সাধুভাষার জনক বলা হয়।

❖ **নিচে সাধুভাষার উদাহরণ দেওয়া হলো:**

➲ নদীতে স্নান করিবার সময় রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলকোণ হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কতিপয় দিবস পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে, ঐ মৎস্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে তদীয় উদরমধ্যে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল। [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: শকুন্তলা]

সাধুভাষার তুলনায় চলিতভাষা বা চলিতরীতি নতুন। সাধুরীতির জন্ম হয়েছে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আর চলিতভাষার সৃষ্টি হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে। সব ধরনের কৃত্রিমতা থেকে লিখিত বাংলা ভাষাকে মুক্ত করাই চলিতভাষা সৃষ্টির প্রেরণা। এ-ভাষারীতির শব্দসমূহ স্বভাবতই আমাদের পরিচিত। বাংলা প্রবাদ-প্রবচন খুব সহজে এ-ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

❖ নিচে বাংলা চলিতরীতির উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

➲ সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষ মিলিত হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষ মিলিত হয় কেবল মেলারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সবজি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। [রবীন্দ্রনাথ: সাহিত্যের তাৎপর্য।]

➢ সাধু ও চলিত ভাষারীতির কয়েকটি পার্থক্য:

সাধু রীতি	চলিত রীতি
১। সাধু ভাষারীতি শুধু লেখার ভাষা।	১। চলিত ভাষারীতি সবার কাছে বোধগম্য মুখের ও লেখার ভাষা।
২। সাধু ভাষারীতি সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে।	২। চলিত ভাষা সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না।
৪। সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	৪। চলিত ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম।
৫। সাধু ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়।	৫। চলিত ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী।
৬। সাধু ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।	৬। চলিত ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়পদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। কোন ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি?
(ক) চলিত ভাষা (খ) উপভাষা
(গ) দ্বিতীয় ভাষা (ঘ) সাধু ভাষা ⓖ ঘ

০২। সাধুরীতির জন্ম হয়েছে কত খ্রিষ্টাব্দে?
(ক) ১৯১৪ (খ) ১৯৫০ (গ) ১৮৫৭ (ঘ) ১৮০০ ঘ

০৩। মনের ভাব প্রকাশ করা যায়-
(i) সংকেতের মাধ্যমে (ii) চিহ্নের মাধ্যমে (iii) প্রতীকের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ঘ

০৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ভাষারীতির জনক হিসেবে পরিচিত?
(ক) সাধু রীতি (খ) চলিত রীতি
(গ) কথ্য ভাষা (ঘ) সামাজিক ভাষা ক
ব্যাখ্যা: (ক); ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা সাধু গদ্যের জনক বলা হয়।

০৫। চিকিৎসকদের ভাষা কোন ভাষার অন্তর্গত?
(ক) সামাজিক ভাষা (খ) দ্বিতীয় ভাষা
(গ) পেশাগত ভাষা (ঘ) বিদেশি ভাষা গ

০৬। বর্ণ অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে কোন ধরনের লিখনরীতি বলে?
(ক) বর্ণভিত্তিক (গ) ভাবাত্মক
(খ) অক্ষরভিত্তিক (ঘ) ভাষাভিত্তিক ক

০৭। ছবি এঁকে যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে কোন ধরনের লিখনরীতি বলে?
(ক) বর্ণভিত্তিক (খ) ভাবাত্মক
(গ) অক্ষরভিত্তিক (ঘ) ভাষাভিত্তিক গ

০৮। নিচের কোন ভাষার ভাবাত্মক লিখন পদ্ধতি রয়েছে?
(ক) বাংলা (খ) তামিল (গ) জাপানি (ঘ) কোরীয় ঘ

০৯। নিচের কোন ভাষার লিখন পদ্ধতি অক্ষরভিত্তিক?
(ক) বাংলা (খ) তামিল (গ) জাপানি (ঘ) কোরীয় গ

১০। ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান কোনটি?
(ক) শব্দ (খ) বাক্য (গ) ধ্বনি (ঘ) বাগর্থ গ

১১। ভাষার তৃতীয় উপাদান কোনটি?
(ক) শব্দ (খ) বাক্য (গ) ধ্বনি (ঘ) বাগর্থ খ

১২। সংকেত ভাষা প্রকাশ করা হয়-
(i) হাত মাথায় উঠিয়ে (ii) বুকে হাত দিয়ে
(iii) হাতের আঙুল ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ঘ

১৩। ইশারা ভাষার অপর নাম কী?
(ক) চোখের ভাষা (খ) ভাব-বিনিময়ের ভাষা
(গ) বর্ণনার ভাষা (ঘ) সংকেত ভাষা ঘ

১৪। জন্মের পর থেকে যার সেবা ও যত্নে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার কাছ থেকে শেখা ভাষাকে বলে-
(ক) মাতৃভাষা (খ) উপভাষা
(গ) তৃতীয় ভাষা (ঘ) প্রমিত ভাষা ক

১৫। কথার টুকরো অংশকে কী বলে?
(ক) বর্ণ (খ) ধ্বনি
(গ) শব্দ (ঘ) অক্ষর ঘ

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। প্রাণিজগতে একমাত্র কাদের ভাষা আছে?
(ক) পাখির (খ) পশুর (গ) মানুষের (ঘ) সবার গ

০২। ভাষা ব্যবহারের জন্য অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ ব্যতিক্রম যে দিক থেকে তা হলো-
(i) স্নায়ুতন্ত্র (ii) মস্তিষ্ক (iii) মানুষের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) i, ii, iii ঘ

০৩। ভাষার মাধ্যমে আমরা যে ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করি তা হলো-
(i) হিংসা-বিদ্বেষ (ii) ভালোলাগা-ভালোবাসা (iii) ঘৃণা, ক্ষোভ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) i, ii, iii ঘ

০৪। ভাষাকে দেশগঠনের কী হিসেবে গ্রহণ করা হয়?
(ক) মাধ্যম (খ) হাতিয়ার (গ) অঙ্গ (ঘ) বাহক খ